Available online at http://www.ijims.com
ISSN: 2348 – 0343

An in depth analysis of a song of Tagore : *shudhu jaowa asa*

শুধু যাওয়া আসা : অন্তরঙ্গ পাঠ

Nag, Goutam Kumar

Abstract

The object of study of the present paper is a well known song of Tagore : *shudhu jaowa asa.* This study is confined to the poetic aspect of the song ; the musical aspect is excluded. Here Tagore dwells on one aspect of love : the inability to communicate. The theme of this song is the gap between thought and language. We have undertaken an in depth study of the song at lexical, morpho-syntactic and semantic levels. We have attempted to demonstrate that the salient linguistic features of this song are in conformity with its theme.

Key Words : love, thought, language, gap, linguistic features

Article

এই নিবন্ধটি একটি সুপরিচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্তরঙ্গ ও ভিন্নতর পাঠ : শুধু যাওয়া আসা (পর্যায় : বিচিত্র গানসংখ্যা : ৬৯)। এর সাঙ্গীতিক রূপটি নয়, আমাদের আলোচ্য এর কাব্যরূপটি। এই গানের কাব্য অবয়বের সৌন্দর্য আস্বাদনের লক্ষ্যে আমরা এর বিভিন্ন গঠক উপাদানের বিশ্লেষণ করব : শব্দচয়ন,পদসমূহের পারস্পরিক অন্বয়, বাক্যের গঠনকৌশল, বিভিন্ন ব্যাকরণগত উপাদানের ব্যবহার।

শুধু যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাসা,
শুধু আলো-আঁধারে কাঁদা-হাসা।।
শুধু দেখা পাওয়া, শুধু ছুঁয়ে যাওয়া,
শুধু দূরে যেতে যেতে কেঁদে চাওয়া,
শুধু নব দুরাশায় আগে চ'লে যায়---
পিছে ফেলে যায় মিছে আশা ।।
অশেষ বাসনা লয়ে ভাঙা বল,
প্রাণপণ কাজে পায় ভাঙা ফল,
ভাঙা তরী ধ'রে ভাসে পারাবারে,
ভাব কেঁদে মরে --- ভাঙা ভাষা।
হৃদয়ে হৃদয়ে আধো পরিচয়,
আধখানি কথা সাঙ্গ নাহি হয়,
লাজে ভয়ে ত্রাসে আধো-বিশ্বাসে
শুধু আধখানি ভালোবাসা।।[১]

চিরাচরিত আলোচনারীতি অনুযায়ী প্রথম কলি থেকে আলোচনার সূত্রপাত করে তারপর ক্রমান্বয়ে পরবর্তী অংশগুলির বিশ্লেষণ করার পরিবর্তে আমরা একেবারে শেষ থেকে শুরু করব। গানের শেষ কথাটি সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ --- বলা যেতে পারে এই গানের key word : ভালোবাসা। এই গানের যাত্রাপথের উৎসস্থল "ভালোবাসা"। ভালোবাসার কোন বিশেষ দিকটি এই গানে উন্মোচিত হয়েছে সেই প্রশ্নের উত্তর মিলবে সঞ্চারীর শেষ কলিতে অর্থাৎ গানের দশম কলিতে :

ভাব কেঁদে মরে --- ভাঙা ভাষা

এই কলিটিকেই গানের ভাববস্তুর সারাৎসার বলা যেতে পারে। প্রথম উন্মেষিত প্রেম প্রাণপণ প্রয়াসে আপনাকে প্রকাশ করতে চায়, পথ খুঁজে পায় না। সহস্রধারে উচ্ছ্বসিত ভাবধারা রুদ্ধবাণীর দুর্লঙ্ঘ প্রাচীরে বারবার প্রতিহত হয়। "চিত্রাঙ্গদা" নৃত্যনাট্যে চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুনের দ্বৈতসঙ্গীতের ভাষায় বলা যায় :

ভাষাহারা মম বিজন রোদনা
প্রকাশের লাগি করেছে সাধনা [২]

কিন্তু এই সাধনার অবসানের, চিরজীবনের বাণীর বেদনা মিটে যাওয়ার কোন ইঙ্গিত এই গানে মেলে না। প্রেমের সেই চিরন্তন বাধা --- ভাব ও ভাষার মধ্যে অনপনেয় ব্যবধানই এই গানের উপজীব্য বিষয়।

উল্লিখিত কলিটিতে শুধু গানের মর্মবাণীই নিহিত নেই, এই কলিতে গানের রচনাশৈলীরও নিশানা পাওয়া যাবে। গানের প্রায় সর্বত্র ভাব অভিব্যক্ত হয়েছে "ভাঙা ভাষায়"। কাব্যরূপের ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের বিস্তারিত আলোচনায় আমরা দেখব এই গানে অসম্পূর্ণ বাক্যের প্রাধান্য। চোদ্দ কলিবিশিষ্ট এই গানে উদ্দেশ্য ও বিধেয় নিয়ে গঠিত পূর্ণাঙ্গ বাক্যের সংখ্যা মাত্র দুই। প্রথম সম্পূর্ণ বাক্যটি আমাদের আলোচ্য দশম কলির প্রথমার্ধে, দ্বিতীয় বাক্যটি দ্বাদশ কলি জুড়ে আছে। বাক্য দুটি হল :

ভাব কেঁদে মরে
আধখানি কথা সাঙ্গ নাহি হয়

লক্ষণীয় দুটি বাক্যের কর্তা যথাক্রমে "ভাব" ও "কথা"। যে "ভাব' ও "কথা"র দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে এই গানটি আবর্তিত হয়েছে তারা ব্যাকরণগত গঠনের পর্যায়েও বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। গানের মধ্যে কেবল এই দুটি পদই পূর্ণাঙ্গ বাক্যের কর্তা।

এই বক্তব্যের আলোকে এবার আমরা সমগ্র গানটি বিশ্লেষণ করব। প্রাথমিক পাঠে অন্যান্য আর যে সমস্ত ভাষাগত বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে আমরা তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেব।

এই গানের স্থাপত্যশৈলীর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল একই শব্দের পৌনঃপৌনিক প্রয়োগ। তেমন তিনটি শব্দ হল "শুধু", "ভাঙা" ও "আধো"। গানের মানচিত্রে "শুধু"র বিশেষ অবস্থান প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথম পাঠে নয়, বলা চলে প্রথম দর্শনেই পাঠক এই গানে শব্দটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে। পরপর প্রথম পাঁচটি কলির শুরুতেই এবং কলির বাকি অংশ থেকে অনেকখানি দূরত্বে "শুধু"র অবস্থান। কেবল কলির শুরুতেই নয়, প্রথম ও তৃতীয় কলির অভ্যন্তরেও "শুধু"র সমান্তরাল অবস্থান। স্থায়ী ও অন্তরার ছয়টি কলির মধ্যে পাঁচটি কলিতে সব মিলিয়ে সাতবার "শুধু"র ব্যবহার। অন্তরায় ও আভোগের তিনটি কলিতে অনুপস্থিতির পর শেষ কলিতে "শুধু"র পুনরাবির্ভাব। চোদ্দকলিবিশিষ্ট গানে মোট আটবার এই শব্দের ব্যবহার হয়েছে। এই শব্দটি এই গানে সর্বাধিক ব্যবহৃত । "শুধু"র প্রয়োগসংখ্যা অপর দুটি শব্দের প্রয়োগসংখ্যার যোগফলের সমান। চারকলিবিশিষ্ট সঞ্চারী ও আভোগের প্রতিটি

কলিতে যথাক্রমে "ভাঙা" ও "আধো" শব্দযুগলের ব্যবহার। এছাড়াও এই গানে একাধিক ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে, তবে সেইক্ষেত্রে রূপান্তর ঘটেছে। গানের বিস্তারিত আলোচনায় আমরা এই প্রসঙ্গে আসব। আপাতত আমরা পূর্বোক্ত তিনটি শব্দের উপস্থিতির ভিত্তিতে সমগ্র গানটিকে তিনটি পর্বে বিভক্ত করতে পারি। প্রথম পর্ব স্থায়ী ও অন্তরা, দ্বিতীয় পর্ব সঞ্চারী এবং তৃতীয় পর্ব আভোগ।

গানের প্রথম চারটি কলি অর্থাৎ স্থায়ী এবং অন্তরা অংশের প্রথম দুটি কলির মধ্যে একটা গঠনগত প্রতিসাম্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত দুটি কলিতে "শুধু" শব্দের সমসংখ্যক প্রয়োগ এবং প্রতিসম অবস্থান দেখা যায়। দ্বিতীয়ত বিভিন্ন গঠক উপাদানের মধ্যে একটা চারিত্রিক ঐক্য ধরা পড়ে। এই অংশে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের (infinitive) আধিপত্য, একটিও সমাপিকা ক্রিয়া নেই। "ভাঙা ভাষায়" ভাব প্রকাশের প্রথম উদাহরণ আমরা দেখলাম।

উল্লেখ্য "শুধু" শব্দটির মত এই অংশের ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যগুলির অবস্থানেও প্রতিসাম্য লক্ষ্য করা যায়। এই অংশে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য প্রতি দুই কলির তিন-চতুর্থাংশ অধিকার করে আছে। গঠনকৌশলটি চিত্রাকারে এইভাবে উপস্থাপনা করা যেতে পারে :

শুধু ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য , শুধু ... ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য
শুধু ..... , ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য
শুধু ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য , শুধু ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য
শুধু ....., ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য

এবার আমরা ভাঙা ভাষায় ব্যক্ত ভাবের স্বরূপ বিশ্লেষণ করব। গানের শুরু হয়েছে আশাহত মনের অবরুদ্ধ দীর্ঘশ্বাসে। আসা যাওয়ার পরিশ্রমই সার, সব উদ্যমই বিফল, অন্ততপক্ষে আকাঙ্ক্ষিত ফললাভ হয় না --- যাওয়া আসা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যযুগলের সঙ্গে "শুধু"র সংযোজনে সেই অনুভূতির সঞ্চার হয়। ব্যর্থতা বা সাফল্য যাই হোক না কেন কলির প্রথমার্ধে অন্তত একটা সক্রিয় প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে সেই উদ্যমের লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। কলির দুই অংশে প্রযুক্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যগুলির আর্থ চরিত্র (semantic character) এক ; "যাওয়া" "আসা" এবং "ভাসা" সব পদই গতিদ্যোতক। কিন্তু তবু একটা পার্থক্য রয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে এই গতির নিয়ন্তা স্বয়ং সেই যাত্রী --- গানের প্রথম পর্বে যে অন্তরালেই থেকে যায়। তারই সচেতন ইচ্ছার প্রকাশ এই গতির বৈচিত্র্যে , আসা –যাওয়ার বৈপরীত্যে। সেই বৈপরীত্য কলির দ্বিতীয়ার্ধে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত। এবার চালিকাশক্তি প্রবহমান স্রোতোধারা। এখন কেবল স্রোতের টানে এক স্থান থেকে স্থানান্তরে চলা --- সমস্ত সচেতন ইচ্ছাশক্তি যেন অবলুপ্ত হয়ে গেছে। সক্রিয় গতিময়তায় যে কলির শুরু তার সমাপ্তি এক অসহায় আত্মসমর্পণে।

প্রথম কলির দ্বিতীয়ার্ধে অনুপস্থিতির পর পরবর্তী কলি জুড়ে আবার বিপরীতের সহাবস্থান। বৈপরীত্য যেমন বহির্জীবনে, তেমনি অন্তর্জীবনে। নিসর্গজগতের পটভূমিতে আলো–আঁধারের বৈপরীত্য, সমান্তরালভাবে মানবসংসারে কান্নাহাসির বৈপরীত্য। প্রথম দুই কলির তিন চতুর্থাংশ জুড়ে বিপরীতের দ্বন্দ্ব।

এই বিপরীতের সহাবস্থান রবীন্দ্রনাথের গানের একটা শৈলীগত বৈশিষ্ট্য। বহু গানেই আমরা দেখি দুই বিপরীত --- সুখ-দুঃখ, মিলন-বিরহ, হাসি-কান্না, আলো-আঁধার, সুন্দর-অসুন্দর ---- সবই একসূত্রে গ্রথিত হয়েছে , দুইয়ে মিলে এক মহান ঐকতান রচনা করেছে। দুইয়ের মধ্যেই কবি প্রত্যক্ষ করেন বিশ্ববিধাতার অন্তহীন লীলার বিচিত্র অভিব্যক্তি। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ বিচিত্র পর্যায়ের পাঁচ নং গানটি : দুই হাতে কালের মন্দিরা যে।[৩] এই গানের প্রায় প্রতিটি কলিতে বিপরীতের অবস্থান --- ডান-বাঁ, ফুল-কাঁটা, আলো-ছায়া, জোয়ার-ভাঁটা, দুঃখ-সুখ, সাঁঝ-সকাল, সাদা-কালো, কান্না-হাসি, মরণ-বাঁচন। এই বিপরীতের দ্বন্দ্বেই রচিত হয় জীবনের ছন্দ। কিন্তু আমাদের আলোচ্য গানের এই

অংশে বিপরীতের দ্বন্দ্ব বৈচিত্র্যের ব্যঞ্জনাবাহী হয়ে দেখা দেয় না। এখানে আমরা সেই রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর শুনি না যিনি বলেন

তোমার আঁধার তোমার আলো দুই আমারে লাগল ভালো [৪]

অথবা সেই রবীন্দ্রনাথকে দেখি না যিনি হাসিকান্নার মধ্যে নটরাজের ললাটে শোভমান হীরাপান্না প্রত্যক্ষ করেন। "শুধু"র পৌনঃপৌনিক প্রয়োগের কারণে আলো-আঁধারের বা হাসি-কান্নার চক্রাকার আবর্তন এক ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তিরূপে প্রতীয়মান হয়। এই বিপরীতের সামনে দাঁড়িয়ে জীবনকে তার পরিব্যাপ্তিতে, তার পূর্ণ বৈচিত্র্যে দেখার সাধ জাগে না, সব কিছুকে ছাপিয়ে যায় এক গভীর আসারতাবোধ।

পরবর্তী কলিতে "শুধু"র পরই আসে মিলনের অনুষঙ্গবাহী পদগুচ্ছ "দেখা পাওয়া"। এই আসা যাওয়া, এই সমস্ত উদ্যমের লক্ষ্য এই প্রাপ্তিটুকু। কিন্তু সেই প্রাপ্তির আনন্দ দীর্ঘায়িত হয় না। এই ক্ষণিকের দেখা না দেখার অতৃপ্তিকেই গভীরতর করে তোলে --- "শুধু"র উপস্থিতি সেই সঙ্কেত দিচ্ছে। কলির দ্বিতীয়ার্ধে আসে "দেখা"র থেকেও নিবিড়তর মিলনের অনুষঙ্গদ্যোতক "ছোঁওয়া"। কিন্তু এবার "শুধু"র উপস্থিতির সঙ্গে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য "যাওয়া"র সংযোজনে মিলনমুহূর্তের ক্ষণস্থায়িত্বের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথম কলিতে সমান্তরাল অবস্থানে আছে "স্রোত"। এই কলিতে "স্রোত" শব্দটি না থাকলেও স্রোতের চিত্রকল্পটি এখানে প্রচ্ছন্ন থাকে। এই স্রোতোধারাই অতি নিকটে টেনে আনে যার ফলে বহুবাঞ্ছিত স্পর্শটুকু মেলে। পরমুহূর্তে সেই স্রোতই আবার বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যায় বহুদূরে। একমুহূর্তে খুব কাছাকাছি আসার পরই পরবর্তী কলিতে দেখা যায় ক্রমবর্ধমান দূরত্ব। তৃতীয় কলির দ্বিতীয়ার্ধে গানের শুরুতে প্রযুক্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য "যাওয়া"র পুনরাবৃত্তির পর চতুর্থ কলিতে সমধাতুজ তে-অন্ত অসমাপিকা ক্রিয়া "যেতে যেতে"র ব্যবহার। গতিময়তা দিয়ে এই গানের শুরু, এই অংশে সেই গতির একটা নির্দিষ্ট অভিমুখ লক্ষ্য করা যায়। এই গতি দূর থেকে সুদূরে। প্রথম কলির মত এই অংশে "যাওয়া"র বিপরীতে "আসা" নেই। একইভাবে দ্বিতীয় কলিতে "কাঁদা"র সমান্তরালে চতুর্থ কলিতে এসেছে অসমাপিকা ক্রিয়া "কেঁদে" কিন্তু এবার পূর্ববর্তী কলির মত "কাঁদা"র বিপরীতে "হাসা" নেই। শুধুই অবিরল অশ্রুধারা --- সেই স্রোত কান্নাস্রোত হয়ে ওঠে।

স্থায়ী অংশের মত অন্তরার প্রথম দুই কলিতে বিপরীতের সহাবস্থান না থাকলেও এই অংশের শুরু ও শেষের মধ্যে এক অর্থে বৈপরীত্য রয়েছে। এই অংশের শেষ ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য "চাওয়া" দ্ব্যর্থবোধক। সেই অনুসারে এই অংশের দুটি পাঠ সম্ভব। একটি পাঠ অনুযায়ী শব্দটি "চাহনি" বা "দৃষ্টি" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এই অংশের শুরুতে দৃষ্টিপাত, দৃষ্টিপাত শেষেও। কিন্তু শুরুতে সেই দৃষ্টিতে ক্ষীণ হলেও প্রাপ্তির যে আনন্দের আভাসটুকু থাকে শেষে তা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়ে যায়। শেষে থাকে শুধু অশ্রুকলুষিত দৃষ্টি। দ্বিতীয় পাঠ অনুসারে "চাওয়া" শব্দটি "ইচ্ছা করা" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাপ্ত ফল আশানুরূপ নয় --- "শুধু"র পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে সেই ধারণারই সৃষ্টি হয়। অন্যভাবে বলা যায় এই প্রয়োগের মধ্য দিয়ে চাওয়া ও পাওয়ার বৈষম্য ধরা পড়ে। আমাদের আলোচ্য অংশের শুরুতে "পাওয়া" শেষে "চাওয়া"। ক্ষণিকের সামান্য পাওয়ায় আরও চাওয়ার সৃষ্টি হয়। চাওয়া পাওয়ার দ্বন্দ্ব পরিণত হয় পাওয়া চাওয়ার দ্বন্দ্বে।

আমরা উল্লেখ করেছি এযাবৎ আলোচিত অংশে ভাব ব্যক্ত হয়েছে ভাঙা ভাষায়। কিন্তু স্থায়ী অংশের এবং আমাদের আলোচ্য অন্তরার দুটি কলির মধ্যে একটা পার্থক্য ধরা পড়ে। স্থায়ীর মত অন্তরার কলি দুটিতেও কোন সমাপিকা ক্রিয়ার উপস্থিতি নেই, সম্পূর্ণ বাক্য নেই কিন্তু স্থায়ীর দুটি কলিতে যেখানে ছিল শুধুই বিশেষ্যের সমাহার সেখানে অন্তরার কলিদুটিতে অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগ ঘটেছে। তৃতীয় ও চতুর্থ কলিতে সমান্তরাল অবস্থানে –এ অন্ত অসমাপিকা ক্রিয়া ..... "ছুঁয়ে", "কেঁদে"। এই দুটি ক্ষেত্রে অবশ্য অসমাপিকা ক্রিয়াটি একটি ক্রিয়াবাচক

বিশেষ্যপদগুচ্ছের অন্তর্গত। গানের চতুর্থ কলির প্রথমার্ধে অসমাপিকা ক্রিয়ার স্বাধীন প্রয়োগ দেখা যায় : তে –অন্ত অসমাপিকা ক্রিয়া "যেতে যেতে"। দেখা যাচ্ছে এই অংশে ভাষা "ভাঙা" হলেও ব্যবহৃত ভাষাগত উপাদানে অধিকতর বৈচিত্র্য রয়েছে। ভাষার ভগ্নদশা অতিক্রম করার একটা প্রাথমিক প্রচেষ্টার ইঙ্গিত মেলে।

পরবর্তী দুটি কলিতে ভাঙা ভাষার বাধা অতিক্রম করার পথে আমরা আরও অগ্রসর হই। গানের এই অংশে প্রথম সমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার। পরপর দুটি কলিতেই সমাপিকা ক্রিয়া : "চলে যায়", "ফেলে যায়"। কিন্তু দুটি কলিতেই বাক্যের কর্তা উহ্য। সুতরাং পূর্ণবাক্য এখনও গঠিত হল না। ভাষার ভগ্নদশা কাটিয়ে ওঠার প্রয়াস সম্পূর্ণ হল না।

লক্ষণীয় এই দুটি সমাপিকা পদগুচ্ছেরই প্রধান গঠক উপাদান "যায়" --- "যাওয়া" ক্রিয়ার সমাপিকা রূপ --- যে "যাওয়া" দিয়ে এই গানের শুরু। গানের এই পর্বে দৃশ্যপটের বৃহত্তর অংশ জুড়ে থাকে গমন বা যাত্রার চিত্রকল্প --- যাত্রী কিন্তু এখনও অন্তরালেই রয়ে যায়। ফুটে ওঠে যাত্রাপথ। এই দুই কলির কোনাকুনি দুই অর্ধাংশে স্থিত দুটি শব্দের মধ্য দিয়ে নির্মিত হয় যাত্রাপথ : "আগে" ও "পিছে"। অপর দুই অর্ধাংশে স্থিত দুটি বিশেষ্যপদগুচ্ছের সমন্বয়ে রচিত হয় সেই যাত্রাপথের পটভূমি : "নব দুরাশা", "মিছে আশা"। সেই পথের সবটুকু জুড়ে শুধুই থাকে ব্যর্থ আশা।

পূর্ববর্তী অংশের সঙ্গে তুলনা করলে সমাপিকা ক্রিয়ার উপস্থিতি ছাড়াও এই অংশে গঠনগত আরও পরিবর্তন দেখা যায় --- যা আমাদের এই আলোচনায় প্রাসঙ্গিক হবে। একটি পরিবর্তন প্রয়োগসংখ্যায়। পূর্ববর্তী অংশের সঙ্গে ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখে কলির শুরু হচ্ছে "শুধু"তে কিন্তু কলির দ্বিতীয়ার্ধে এবং পরবর্তী কলির শুরুতে শব্দটি অনুপস্থিত। এযাবৎ প্রত্যেক দুটি কলিতে "শুধু"র প্রয়োগসংখ্যা তিন, এবার এই সংখ্যা এক। পুনরাবৃত্ত শব্দের সংখ্যা দুই কম হলেও আমরা পাই দুটি বিশেষ্য পদগুচ্ছ --- "নব দুরাশা" এবং "মিছে আশা"। "শুধু"র পৌনঃপৌনিক প্রয়োগে যে অনুভূতি সঙ্কেতে ব্যক্ত করা হয়েছে, উল্লিখিত পদগুচ্ছদুটির ব্যবহারে তা সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে। "শুধু"র ব্যবহারে যে অনুভূতি সঞ্চারিত হয় তা অতৃপ্তির, অপূর্ণ আশার। কিন্তু পরবর্তী পদগুচ্ছদুটির মাধ্যমে অভিব্যক্ত অনুভূতি সম্পূর্ণ ব্যর্থতার, নিদারুণ আশাভঙ্গের। "শুধু"র প্রয়োগে অপূর্ণতার সঙ্গে সামান্য হলেও যেটুকু ইতিবাচক অনুষঙ্গ থাকে এই পর্বের শেষ কলিতে তার আর কিছুই বাকি থাকে না।

সামগ্রিক পর্যালোচনায় দেখা গেল গানের এই পর্বের মূল সুরটি পুঞ্জীভূত হতাশার। শুরুতে বিপরীতের দ্বন্দ্বে যে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছিল দ্রুত তার অবসান হয়। হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনায় কোন ঐকতান রচিত হয় না, শেষে একটি সুরেই গান বাধা হয়, সবকিছুকে ছাপিয়ে যায় বিষদ-জর্জর হৃদয়ের হাহাকার।সেই হাহাকার তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে। ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের পর্যায়ে দেখা যায় এই পর্বে "শুধু" ছাড়াও "যাওয়া"ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি। ছটি কলির মধ্যে পাঁচটিতেই এই গতিদ্যোতক ক্রিয়ার উপস্থিতি, কখনও ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যপে কখনও অসমাপিকা ক্রিয়ারূপে, কখনও সমাপিকা ক্রিয়ারূপে। এই গতি ব্যর্থতা থেকে নূতনতর ব্যর্থতায় নিয়ে যায় । এর শেষ হয় মিছে আশায়। আমরা দেখেছি আর একটি ক্রিয়ারও পুনরাবৃত্তি হয়েছে : কাঁদা । এই পুনরাবৃত্তিও গানের মর্মবস্তুর সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ।

গানের দ্বিতীয় পর্বের প্রতিটি কলিতে বিশেষণ "ভাঙা" উপস্থিত থাকলেও এই পর্বের সূচনা কিন্তু ভগ্নহৃদয়ের হাহাকারে নয়, সচনা বিপুল বাসনায়, প্রবল প্রাণশক্তিতে। পুর্ববর্তী প্রথম পর্ব "মিছে আশা"য় শেষ হওয়ার পর কলির শুরুতেই আসে "অশেষ বাসনা" এবং পরের কলিটিতে সমান্তরাল অবস্থানে আসে "প্রাণপণ কাজ"। শুধু"র পুনরাবৃত্তির অবসানে এবং কলির শুরুতে উদ্দীপনাদ্যোতক পদগুচ্ছের প্রয়োগে নূতন প্রত্যাশার সঞ্চার হয়। আশা জাগে পূর্বের সব বিফলতা, সব ব্যর্থতার আবসানে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা ঘটবে। কিন্তু সেই আশা তৎক্ষণাৎ ধূলিসাৎ হয়। এই দুই কলির শেষে প্রতিসম সমান্তরাল অবস্থানে আসে বিশেষণ "ভাঙা" : "ভাঙা বল" "ভাঙা ফল"।

এই গঠক উপাদানসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধ দুটি দৃষ্টিকোন থেকে দেখা যেতে পারে। দুই কলির অনুভূমিক পাঠে (horizontal reading) একটা সমান্তরাল দ্বন্দ্ব বা সংঘাতের রূপ ফুটে ওঠে। "অশেষ বাসনা"র রূপায়ণের পথে অন্তরায় "ভাঙা বল"। এই কলিতে সাধ ও সাধ্যের দ্বন্দ্ব। পরের কলিতে ধরা পড়ে প্রয়াস ও প্রাপ্তির বৈষম্য। "প্রাণপণ কাজে"র পরিণতি হয় "ভাঙা ফল"। এরপর এই দুই কলির স্তম্ভাকার পাঠে (vertical reading) একটা সমান্তরাল কার্যকারণ সম্বন্ধ লক্ষ্য করা যায়। "অশেষ বাসনা"র রূপায়ণ "প্রাণপণ কাজে" আর "ভাঙা বল"এর পরিণাম "ভাঙা ফল"।

এই দুই কলির শুরু হয়েছিল বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে আবার তার সমাপ্তি হয় নূতনতর ব্যর্থতায়। যে "অশেষ বাসনা" দিয়ে এই পর্বের শুরু দেখা যায়, তা শুধুই "নব দুরাশা"। পরবর্তী কলিতে "প্রাণপণ কাজ" প্রকৃতপক্ষে "নব দুরাশায় আগে চলে যাওয়া" ছাড়া আর কিছু নয়। এই যাত্রাপথ জুড়ে থাকে "মিছে আশা"। যে ব্যর্থতা, যে হতাশার বার্তা প্রথম পর্বের শেষ দুটি কলিতে দেখি, আমাদের আলোচ্য এই দুটি কলিতে তারই পুনরাবৃত্তি। পার্থক্য উপস্থাপনাকৌশলে। পুর্ববর্তী কলিদুটিতে শুধুই নেতিবাচক অনুষঙ্গদ্যোতক পদগুচ্ছের সমন্বয় ("নব দুরাশা", "মিছে আশা"। কিন্তু আমাদের আলোচ্য কলিদুটি একটা ভিন্নতর মাত্রা লাভ করে ইতিবাচক ও নেতিবাচক অনুষঙ্গবাহী পদগুচ্ছের বৈপরীত্যে। শুরুতে উদ্দীপনাদ্যোতক বা প্রত্যাশাসূচক পদগুচ্ছের উপস্থিতি ব্যর্থতার বেদনাকে আরও করুণ করে তোলে।

এই দুই কলিতে একটি সমাপিকা ক্রিয়া : পায়। এই ক্রিয়াটির পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। আমরা দেখেছি গানের দ্বিতীয় কলির প্রথমার্ধে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের রূপটি ব্যবহৃত হয়েছে : পাওয়া। দুটি ক্ষেত্রে প্রাপ্ত ফলের তুলনামূলক আলোচনায় একটা অবনমন পরিলক্ষিত হয়। প্রথম ক্ষেত্রে প্রাপ্তি দর্শনলাভ। এই দেখা যতই ক্ষণস্থায়ী হোক না কেন, এর মধ্যে সামান্য হলেও প্রাপ্তির আনন্দ আছে। পক্ষান্তরে পরবর্তী ক্ষেত্রে প্রাপ্তফল স্পষ্টতই নৈরাশ্যব্যঞ্জক। এই গানের পথ ধরে আমরা যত অগ্রসর হই, ততই আমরা দেখি ক্রমবর্ধমান হতাশাবোধ।

দ্বিতীয় পর্বের এই অংশেও ভাব প্রকাশের মাধ্যম "ভাঙা ভাষা"। প্রথম পর্বের পর এই পর্বের শুরুতেও পূর্ণবাক্য গঠিত হল না। পূর্ববর্তী পর্বের শেষ দুটি কলির ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখে এবারও সমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত কর্তৃপদবিহীন অসম্পূর্ণ বাক্য ব্যবহৃত হল। তবে বাক্যের সংখ্যায় ও আয়তনে পার্থক্য রয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে দুটি কলির প্রত্যেকটিতে একটি অসম্পূর্ণ বাক্য। অন্যদিকে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে একটি অসম্পূর্ণ বাক্য দুটি কলিতে বিস্তৃত। এটি এই গানের দীর্ঘতম একক অসম্পূর্ণ বাক্য । এই বিস্তৃতিকে ঘটনাবলীর পরিধির দৈর্ঘ্যেরই প্রতীক বলে ভাবা যেতে পারে। যে পরিসর জুড়ে অশেষ বাসনা নিয়ে লক্ষ্যপূরণের নিরন্তর প্রয়াস চলছে আর কেবল উপর্যুপরি ব্যর্থতা আসছে সেই পরিসরের ব্যাপ্তির প্রতিফলন বাক্যের দৈর্ঘ্যে।

এরপর "ভাঙা"র অবস্থান পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই বিশেষণের পুনরাবৃত্তি আর দুই কলির শেষে সমান্তরালভাবে নয়, এই পুনরাবৃত্তি প্রথম কলির শুরতে এবং পরবর্তী কলির শেষে । "ভাঙা"র এই কোনাকুনি অবস্থানে একটা পরিব্যাপ্ত ধ্বংসের ছবি ফুটে ওঠে।

এই পর্বের প্রথম দুই কলির সূচনা যেখানে উৎসাহ, উদ্দীপনায়, তৃতীয় কলির সূচনা সেখানে ভগ্নদশা দিয়ে --- যে ভগ্নদশায় পূর্বোক্ত কলিদুটির সমাপ্তি ঘটেছিল। কিন্তু তৃতীয় ও প্রথম কলির প্রথমার্ধের গঠনে প্রতিসাম্য দেখা যায়। দুই অর্ধাংশের গঠনকৌশল হল :

কলিসংখ্যা	বিশেষণ	বিশেষ্য	অসমাপিকা ক্রিয়া
প্রথম	অশেষ	বাসনা	লয়ে
তৃতীয়	ভাঙা	তরী	ধরে

প্রথম কলির পাঠে আমরা সাধ ও সাধের দ্বন্দ্ব দেখেছি, এই দুই কলির প্রথমার্ধের স্তম্ভাকার পাঠে সেই দ্বন্দ্বই ধরা পড়ে। বস্তুতঃ "ভাঙা তরী" "ভাঙা বল"এরই ইন্দ্রিয়গ্রাহী, মূর্ত রূপ। এরপর দুটি অসমাপিকা ক্রিয়ার মধ্যে একটা ঐক্য চোখে পড়ে। দুটি ক্রিয়াই "অবলম্বন করে" অর্থে ব্যবহৃত। তবু এর মধ্যেও দ্বিতীয় ক্রিয়ার প্রয়োগ আরও অসহায় অবস্থা, আরও ব্যাকুল প্রয়াসের ইঙ্গিত বহন করে।

এরপর এই কলির দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে সমাপিকা ক্রিয়া "ভাসে" --- আমরা তার বিশেষ্য রূপটি দেখেছি সমান্তরাল অবস্থানে, গানের প্রথম কলিতে : ভাসা। প্রথম কলির আলোচনায় আদিস্থিত "যাওয়া" এবং দ্বিতীয়ার্ধে স্থিত "ভাসা" ক্রিয়ার প্রয়োগ সম্বন্ধে আমরা বলেছিলাম "যাওয়া"র মধ্যে যে সচেতন, সক্রিয় প্রয়াস রয়েছে তার সমাপ্তি ঘটিয়ে "ভাসা" এক অসহায় আত্মসমর্পণের ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু তবুও সেই উদ্যম, উদ্দীপনা তখনই নিঃশেষিত হয় না। আবার নবতর উদ্যমে দীর্ঘতর প্রয়াস চলে। প্রথম পর্বে বারংবার "যাওয়া" ক্রিয়ার প্রয়োগে তারই প্রতিফলন। এই পর্বে আর "ভাসা" ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি দেখা যায় না। কিন্তু প্রথম পর্বের পর এই গানে আর "যাওয়া" ক্রিয়ার ব্যবহার নেই ; শুধু একবার এই "ভাসা" ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি হয়। অর্থাৎ নূতনতর সব প্রচেষ্টার পরিসমাপ্তি ঘটে সেই অসহায় আত্মসমর্পণেই।

এবার আর প্রথম কলির মত "স্রোতে ভাসা" নয়, জলস্রোত পরিণত হয় "পারাবারে"। লক্ষণীয় প্রথম কলিতে যেমন বাক্যের স্বাভাবিক পদক্রম অনুসারে আধার "স্রোত" এসেছে "ভাসা"র আগে, আমাদের আলোচ্য কলিটিতে তা ঘটে নি। আধার "পারাবারে"র আবির্ভাব ক্রিয়া "ভাসে"র পর। এই অবস্থান আধারের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এছাড়া এই কলির একপ্রান্তে "ভাঙা তরী" এবং অপরপ্রান্তে "পারাবার"এর এই অবস্থান নিমজ্জমান যাত্রীর আত্মরক্ষার ব্যাকুল প্রচেষ্টাকে মর্মান্তিক রূপ দেয়।

এযাবৎ আমরা দেখলাম অসম্বদ্ধ পদগুচ্ছ, খণ্ডিত বাক্য বা বাক্যাংশের মাধ্যমে প্রকাশিত ইতস্তত, বিক্ষিপ্ত অনুভূতি কোন কোন সময়ে উৎসাহের, উদ্দীপনার, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এবং শেষপর্যন্ত তীব্র হতাশার, ব্যাকুল হাহাকারের। কিন্তু কার এই প্রয়াস, কিসের এই সাধনা, কেন এই হাহাকার সে সম্বন্ধে কোন ধারণা গড়ে ওঠে না। অবশেষে দ্বিতীয় পর্বের শেষ কলিতে আমরা উৎসস্থলে এসে উপনীত হই। প্রথমবার সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হল গানের উপজীব্য বিষয় : ভাব ও ভাষার দ্বন্দ্ব। এই কলির দুই প্রান্তে "ভাব" ও "ভাষা"র অবস্থান। এছাড়া পরপর চারবার সমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত অসম্পূর্ণ বাক্যের পর এই কলিতেই প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাক্যের প্রয়োগ ঘটল। প্রথমে আমরা বিশ্লেষণ করব গানের প্রথম সম্পূর্ণ বাক্যটি তারপর ভাব ও ভাষার সম্বন্ধটি।

কর্তা "ভাব", সমাপিকা ক্রিয়া "কেঁদে মরে"। আমরা দেখেছি এই ক্রিয়াটি ভিন্ন রূপে এই গানে আগেও এসেছে। দ্বিতীয় কলির শেষে ছিল ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যরূপ "কাঁদা", তখন বিপরীতে ছিল "হাসা"। এক কলি পরে সমান্তরাল অবস্থানে অসমাপিকা ক্রিয়ারূপের প্রয়োগ : কেঁদে। এবার কান্নার বিপরীতে সব হাসিই মিলিয়ে গেছে। বারংবার নৈরাশ্যের সুর ধ্বনিত হলেও পরবর্তী পাঁচটি কলিতে আর "কাঁদা" ক্রিয়াটির কোন রূপের সঙ্গে যুক্ত সমাপিকা ক্রিয়া "মরে"র প্রয়োগ শুধুই আলঙ্কারিক। এই ক্রিয়াপদগুচ্ছে সম্পূর্ণভাবে "কাঁদা"রই প্রাধান্য। দ্বিতীয় পর্বের শেষে ক্রমবর্ধমান হতাশা শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছয় --- এই পর্বের সমাপ্তি ঘটে অবিরল অশ্রুধারায়।

গানে প্রথম ক্রিয়ার কর্তা "ভাব"। আমরা দেখেছি এর পূর্ববর্তী কয়েকটি কলিতে সমাপিকা ক্রিয়া থাকলেও সবক্ষেত্রেই কর্তা উহ্য রয়েছে। বারবার "যাওয়া" ক্রিয়ার প্রয়োগ হয়েছে, কিন্তু যাত্রী অন্তরালে থেকে গেছে ; অন্যান্য ক্ষেত্রেও ক্রিয়াসম্পাদনকারী কে বা কারা তা গানে অজ্ঞাতই থেকে যায়। এই প্রশ্নের নির্দিষ্ট কোন উত্তর হয় না। এইক্ষেত্রে একাধিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। আমাদের ব্যাখ্যা : সবক্ষেত্রেই অন্তরালে রয়েছে "ভাব"। "যাওয়া"র পৌনঃপৌনিক প্রয়োগের মধ্য দিয়ে প্রকাশোন্মুখ "ভাব"এর বিচিত্র গতিই প্রকাশিত ; এর মধ্যে স্থানান্তর নির্দেশ করা হয় নি। অন্যান্য সমস্ত ক্রিয়াকেও ভাবেরই নানা অভিব্যক্তি বলেই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। দীর্ঘক্ষণ অন্তরালে থাকার পর দ্বিতীয় পর্বের শেষে "ভাব" সুস্পষ্ট ভাষায় আত্মপ্রকাশ করে --- পূর্ণবাক্যের কর্তার রূপে।

এবার আমরা এই গানে ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির বিষয়টি আলোচনা করব। শুরুতেই আমরা দেখেছি গানের প্রথম চারটি কলিতে সমাপিকা ক্রিয়ার সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি এবং ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের একাধিপত্য। এরপর পঞ্চম থেকে দশম কলি পর্যন্ত যে পাঁচটি সমাপিকা ক্রিয়াপদ বা ক্রিয়াপদগুচ্ছ ব্যবহৃত হয়েছে (সপ্তম কলিতে সমাপিকা ক্রিয়া অনুপস্থিত) তাদের প্রত্যকটিকেই আমরা গানের প্রথম দুই কলিতে এবং তৃতীয় কলির প্রথমার্ধে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যরূপে দেখা যায়। অর্থাৎ গানের প্রথমাংশে যে কয়েকটি ক্রিয়ার বিশেষ্যরূপ ব্যবহার করা হয়েছে তার বাইরে নূতন কোন সমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহার করা হয় নি। এই পর্বের শেষ কলিতে "কেঁদে মরে" ক্রিয়াপদগুচ্ছে "মরে" ক্রিয়ার বিশেষ্যরূপটি এই গানে আগে ব্যবহৃত হয় নি ; কিন্তু আমরা উল্লেখ করেছি এক্ষেত্রে অর্থপ্রাধান্য "কেঁদে"র এবং তার বিশেষ্যরূপটি আগেই ব্যবহৃত হয়েছে। চিত্রাকারে বিষয়টি এইভাবে উপস্থাপনা করা যেতে পারে।

কলিসংখ্যা	সমাপিকা ক্রিয়া	ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যরূপ	কলিসংখ্যা
৫	(চলে) যায়	যাওয়া	১ /৩
৬	(ফেলে) যায়	যাওয়া	১ /৩
৮	পায়	পাওয়া	৩
৯	ভাসে	ভাসা	১
১০	কেঁদে (মরে)	কাঁদা	২

ক্রিয়ার এমন প্রয়োগবৈশিষ্ট্যের তাৎপর্য দুভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। একাধিক ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি এক ক্লান্তি-আবেশ সঞ্চারের পক্ষে অনুকূল। ক্রিয়ার রূপান্তরের বিশ্লেষণ করতে গেলে আবার সেই ভাব ও ভাষার দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গের অবতারণা করতে হয়। আমরা একাধিকবার উল্লেখ করেছি প্রথম চার কলির বৃহত্তম অংশ জুড়ে আছে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য, একটিও সম্পূর্ণ বাক্য নেই। অন্যভাবে বলা চলে এই অংশে কেবল বাক্যনির্মাণের উপাদান আছে কিন্তু নির্মাণপ্রক্রিয়া এখনও শুরু হয় নি। এরপর প্রথম অংশের কয়েকটি ক্রিয়ার সমাপিকা রূপের ব্যবহার দেখা যায় পরবর্তী পাঁচটি কলিতে। ক্রিয়ার কর্তার অনুপস্থিতির কারণে বাক্য তখনও সম্পূর্ণ হয় না, কিন্তু সমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহারের কারণে আমরা সম্পূর্ণ বাক্যের আরও কাছাকাছি আসি। বলা চলে নির্মাণপ্রক্রিয়া এবার শুরু হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায় ভাষার ভগ্নদশা কাটিয়ে ওঠার প্রয়াস শুরু হয়েছে। সেই প্রয়াস সফল হয় পরবর্তী কলিতে। এবার কর্তা ও সমাপিকা ক্রিয়াযোগে প্রথম একটি পূর্ণবাক্য গঠিত হয়।

এই কলির প্রথমার্ধে ভাব ও ভাষার দ্বন্দ্ব অবসিত হলেও সেই দ্বন্দ্বের পুনঃপ্রকাশ কলির দ্বিতীয়ার্ধে। "ভাব" দিয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য রচিত হওয়ার পরও "ভাবের" সঙ্গে ভাষার সম্বন্ধটি ব্যক্ত করা হয়েছে "ভাঙা ভাষা"তেই। এই ভাঙা ভাষা ভাব প্রকাশের মাধ্যম অথবা তার কেঁদে মরার কারণ। এই সম্বন্ধটি ব্যাকরণগতভাবে নির্দেশ করা হয় নি। একই বাক্যে বলা যেত "ভাব কেঁদে মরে ভাঙা ভাষায়" ভাব কেঁদে মরে ভাঙা ভাষার কারণে"। "ভাষা"র সঙ্গে কোন

বিভক্তি বা অন্য কোন শব্দ যোগ না করে মূল বাক্য থেকে যতিচিহ্ন দ্বারা পদগুচ্ছটিকে বিচ্ছিন্ন করে ভাঙা ভাষাকেই আবার ভাবপ্রকাশের মাধ্যম করে নেওয়া হয়েছে।

প্রথম দুই পর্বে প্রকাশিত অনুভূতি স্পষ্টতই নৈরাশ্যের, ব্যর্থতাবোধের। তৃতীয় পর্বে কিন্তু অস্পষ্টতা বা দ্ব্যর্থবোধকতা থেকে যায়। এই পর্বের পাঠে পুনরাবৃত্ত শব্দ "আধো"র ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা দেখে নেব "আধো" র পুনরাবৃত্তি ছাড়া এই পর্বের অন্য আর কি কি বৈশিষ্ট্য আছে।

পূর্ববর্তী দুই পর্বের তুলনায় এই পর্বের একটি স্বাতন্ত্র্য দেখা যায় ক্রিয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রে। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের মত তৃতীয় পর্বে ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি হয়নি ।এই পর্বে একমাত্র দ্বিতীয় কলিতেই একটি সমাপিকা ক্রিয়া "হয়" ব্যবহৃত হয়েছে এবং সেই ক্রিয়াটি পূর্বের দুটি পর্বে কোথাও ব্যবহৃত হয় নি --- এমনকী অসমাপিকা ক্রিয়ারূপে বা বিশেষ্যরূপেও নয়। অন্য তিনটি কলি ক্রিয়াপদবিহীন।

এই পর্বের দ্বিতীয় কলির সঙ্গে দ্বিতীয় পর্বের শেষ কলির একটা তুলনামূলক পর্যালোচনা করা যেতে পারে। আমরা দেখেছি কেবলমাত্র এই দুটি কলিতেই পূর্ণবাক্য রয়েছে ; এই পূর্ণবাক্যের নির্মাণকে আমরা ভাষার ভগ্নদশা থেকে মুক্তি বলে ব্যাখ্যা করেছিলাম। কিন্তু দুটি কলির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে এই মুক্তি সাময়িক --- প্রথমার্ধে সম্পূর্ণ বাক্য থাকলেও দ্বিতীয়ার্ধে ভাঙা ভাষার উদাহরণস্বরূপ আবার আসে বিচ্ছিন্ন শব্দবন্ধ। অন্যদিকে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ বাক্যটি সমস্ত কলি জুড়ে থাকে --- এই কলিতে ভাষার ভাঙনের আর কোন চিহ্ন দেখা যায় না। এই বাক্যের কর্তা "কথা"--- যা ভাষারই প্রতিরূপ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভগ্নদশা থেকে ভাষার (অথবা কথার) পূর্ণমুক্তি ঘটে তখনই যখন ভাষাই (অথবা কথাই) হয় বর্ণনীয় বিষয়।

এবার আমরা পুনরাবৃত্ত শব্দ "আধো"র আলোচনায় আসব। পূর্ববর্তী দুটি পর্বের তুলনায় এখানেও একটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথম দুটি পর্বে সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত অবস্থায় "শুধু" এবং "ভাঙা" শব্দের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। কিন্তু তৃতীয় পর্বে যে চারবার সংখ্যাবাচক শব্দ "আধো" ব্যবহৃত হয়েছে, তার সঙ্গে দ্বিতীয়বার এবং শেষবার যুক্ত হয়েছে নির্দেশক "খানি"। এর তাৎপর্য বিশ্লেষণযোগ্য। এই নির্দেশক সাধারণভাবে বস্তু অথবা জমূর্ত সত্তার ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য অংশে "খানি" যোগে "কথা" এবং "ভালোবাসা" যেন মূর্ত সত্তার রূপ লাভ করে, অবয়ব গ্রহণ করে। একইসঙ্গে যে "ভাব" ও "ভাষা"র দ্বন্দ্ব এই গানের উপজীব্য, এই নির্দেশক "খানি"র সংযোজন সেই "ভাব" ও "ভাষা"কে একটা বাড়তি গুরুত্ব দেয়। কথা ভাষারই প্রতিরূপ এবং এই যে ভাবকে ভিত্তি করে এই গানের নির্মাণ, সেই ভাব হল "ভালোবাসা"।

এবার আমরা "আধো"র আর্থ তাৎপর্য (semantic significance) বিশ্লেষণ করব। ভগ্নাংশবাচক এই শব্দটিকে ইতিবাচক তাৎর্যদ্যোতক না নেতিবাচক তাৎপর্যদ্যোতক কিভাবে চিহ্নিত করা হবে তা সপম্পূর্ণভাবেই আপেক্ষিক। এক্ষেত্রে আধগ্লাস জলের সেই ধ্রুপদী উদাহরণ মনে আসে। একই বাস্তবতাকে অর্ধেক পূর্ণ বা অর্ধেক অপূর্ণ দুইভাবেই ব্যাখ্যা করা চলে। এই শব্দের এই দুই তাৎপর্য অনুসারে আমাদের আলোচ্য অংশের দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত পাঠ সম্ভব। দুটি ব্যাখ্যাই সমান গ্রহণযোগ্য।

নৈরাশ্যবাদী মন গানের এই পর্বে পূর্ববর্তী দুই পর্বেরই প্রতিধ্বনি শুনবে। এই ব্যাখ্যা অনুসারে প্রথম দুই পর্বের নিষ্ফল প্রয়াস এবং ব্যর্থ হাহাকারের ধারা তৃতীয় পর্বেও অব্যাহত থাকে। হৃদয়ে হৃদয়ে পরিচয়ের পর্বটিই অর্ধসমাপ্ত বা অসমাপ্ত থেকে যায় ; সুতরাং বাইরে পরিচয়পর্ব শুরুই হতে পারে না। মনের কথা অসমাপ্তই রয়ে যায়; "আধোখানি" কথাটুকুও বলা হয়ে ওঠে না। তারপর প্রেমের পথের বাধা তীব্র থেকে তীব্রতর রূপে দেখা দেয় --- লাজ, ভয়, ত্রাস এই শব্দত্রয়ীর প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তারই প্রতিফলন ঘটে। বারংবার আঘাতে আঘাতে বিশ্বাসও আর অটুট থাকে না ; "আধো বিশ্বাস" শব্দগুচ্ছের মধ্য দিয়ে সেই সংশয়েরই বহিঃপ্রকাশ। সমস্ত প্রচেষ্টার, সকল সাধনার প্রাপ্তি হয় অপূর্ণ প্রেম ---- আধখানি ভালোবাসা। এর সঙ্গে "শুধু"র পুনরাবির্ভাব অপ্রাপ্তির বেদনাকেই গভীরতর করে তোলে।

অপরদিকে আশাবাদী মন সব বিফলতা, সব বিপর্যয় ভুলে এই পর্বে প্রাপ্তিটুকুকেই বড় করে দেখে। প্রাথমিক পরিচয়পর্বেই এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। তারপর মনের কথা বলার পালা আসে। বলা হয় কেবল "আধখানি কথা" কিন্তু তার রেশটুকু চিরস্থায়ী হয়ে থাকে। পরপর বাধা আসে --- লাজ, ভয়, ত্রাস। তবু শেষপর্যন্তও বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভঙ্গ হয় না; সব হতাশা, সব সংশয় ছাপিয়ে জেগে থাকে "আধো বিশ্বাস" । তারই বলে বলীয়ান হয়ে সব বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে চলা। ভালোবাসা আধখানি --- কিন্তু সেই "আধখানি ভালোবাসা"ই সব নৈরাশ্য, সব গ্লানি দূর করে দেয়। "শুধু"র সংযোজনে "আধখানি ভালোবাসা"র শক্তি মূর্ত হয়ে ওঠে।

উল্লেখপঞ্জী

১) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : অখণ্ড গীতবিতান, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০১৩, পৃ ৫৭৩
২) তদেব : পৃ ৬৯৪
৩) তদেব : পৃ ৫৪৫
৪) তদেব : পৃ ৩১

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

খাতুন, সনজীদা : রবীন্দ্রসঙ্গীত মননে লালনে, ঢাকা, নবযুগ প্রকাশনী, ২০১১
চক্রবর্তী, প্রফুল্লকুমার : রবীন্দ্রসঙ্গীত-বীক্ষা : কথা ও সুর,কলকাতা, জিজ্ঞাসা,১৯৮৩
দাস, ক্ষুদিরাম : চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্র-বাণী, কলিকাতা, গ্রন্থনিলয়, বঙ্গাব্দ ১৩৭৩
রায়, আলপনা (সম্পাদিত) : রবীন্দ্রনাথের গান সঙ্গ অনুষঙ্গ, কলকাতা, প্যাপিরাস, ২০০১
রুদ্র, সুব্রত (সম্পাদিত) : রবীন্দ্রসঙ্গীত চিন্তা, কলিকাতা, আশা প্রকাশনী,১৯৮০
সরকার, পবিত্র : দ্বন্দ্ববিরোধ : রবীন্দ্রসংগীতের এক সৃজনভিত্তি, গানের ঝরনাতলায়, কলিকাতা, প্রতিভাস, ২০১৩